সংবাদ

তারিখ ... 27 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাই জঙ্গি চাষের উর্বর ভূমি নয় কি?

এএন রাশেদা

পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে কিছু বলাতে একটি পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি এর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখাতে শুরু করলেন। এ প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায় তিনি অট্টহাসি দিয়ে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেই বাতিল হয়ে গেছেন– সে খবর রাখেন কি? এখন সেখানে রবীন্দ্রনাথের দর্শনের প্রতিফলন নেই– ইত্যাদি। মোবাইল ফোনে তার সঙ্গে কোনো তর্কের মানসিকতা সেদিন না থাকলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের তৎপরতা দেখে আজ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনাগুলো সর্বকালের জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক– তা সবাইকে ভেবে দেখার অনুরোধ করব।

তার পূর্বে সামান্য দুটি কথা শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম– সেখানকার শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই যে খুবই মেধাবী তা অনেকেরই জানা। বিজ্ঞান শাখায় বিজ্ঞানের বিষয়ে বিশেষ করে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্সে এরা অধিকাংশই সিরিয়াস। এ সিরিয়াস ছাত্রদের মধ্যেও কিছু কিছু ছাত্রকে বিজ্ঞান লাইনে পড়াশোনা না করে বিবিএ-এমবিএর দিকে ঝুঁকতে দেখা গেছে '৯০-এর দশক থেকেই। পরে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, তাদের অনেকের কাছেই বিষয় হিসেবে বিবিএ অধিক পানসে। মেধা খাটাবার তেমন কিছুই নেই। তবে চাকরির ক্ষেত্রে বিবিএর কদর, তাই পড়ছে। এবং দেশব্যাপী যেসব বেসরকারি নামধারী প্রকৃত অর্থে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল, তাদের উন্নাসিকতাও প্রকাশিত হলো– 'বাংলা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি কোনো পড়ার বিষয় না-কি? এসব পড়ে কি হবে?– চাকরি নেই।' এমন কি স্কুল-কলেজেও এসব বিষয় বাদ দেয়ার দাবিও উত্থাপিত হতে লাগল। এখনও দু-একজন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের টিভিতে আলোচনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিষয়ে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলতেও দেখা যায়। চাকরি প্রাপ্তির জন্য যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেটুকু চর্বিত চর্বন করলেই কি সে মানুষে পরিণত হবে– শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি একজন প্রকৃত 'মানুষ' তৈরি করাকে বোঝায়? আজকের দিনে যখন এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা হাজারে হাজারে জঙ্গিগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে– তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের দিকে আমাদের তো তাকাতেই হবে। তিনি যা বলেছিলেন তা কি অবজ্ঞা করার, না কি তা অনুসরণের? জাপান বেশ কিছু সময় আগেই বিষয়টি ধরতে পেরে মানবিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেদিকে নজর দিয়েছে। দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন ১৮৯২ সালে– রাজশাহীতে, তৎকালীন অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে : 'যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না– বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শিগগিরই পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃকপাত না করিয়া, পুঁথি মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

... তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সব দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গ সন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বিএ, এমএ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। তেমন মুঠো করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।'

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এসে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাতেও আমরা কি তাই দেখছি না? কমিশন-শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণীকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা দিলেও আমাদের আমলা-শ্রেণী নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় পঞ্চম শ্রেণী শেষেই সমাপনী পরীক্ষা নেয়া শুরু করেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে– এর একটাই কারণ হতে পারে – আমলা শ্রেণীর বিল-করে কিছু অর্থ আত্মসাতের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা। নিজেদের পকেট ভরানোর জন্য এ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী শিশুদের জীবন থেকে তাদের আকাশ-বাতাশ, আনন্দ-অবকাশ সবটুকই কেড়ে নিয়েছে। তাদের না আছে অবসর সময়, না আছে খেলাধুলা, নাচ, গান, বা ছবি আঁকার মতো চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো সময়। সকাল থেকে স্কুল আর কোচিং সেন্টারে দৌড়াদৌড়ির মাঝে সবটুকু সময় চলে যাচ্ছে– সব মা-বাবা তাই বলছেন। এক ছাত্রী তার মা-কে বলছে, 'মা পরীক্ষার আগে মরে গেলে ভালো হয় না?' কী করুণ আর্তি! এমন কথা, কত শিশুই যে বলছে– ভাবছে– কে তার খবর রাখে?

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছিলেন, 'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই শুধু যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলো পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে। কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান না-করার কারণকেই অভিযুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই দুশ্চিন্তা আজও দূর হয় নাই– মাটির কাছাকাছি এসে নদী বিধৌত আবহমান বাংলার রূপ-রস টেনে ভাটিয়ালি, বাউল, ভাওয়াইয়া, জারি-সারি, মুরশিদি, কবিগান, নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আবহ থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ঐতিহ্য ধারণ করতে শিক্ষার্থীরা আজও পারছে না। কারণ স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় হত্যা ও ক্যুর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল উল্টোপথে যাত্রা। ৪০ বছর পর রথের চাকাকে ঘুরিয়ে নিতে হবে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনার কাছে– ধর্মনিরপেক্ষতার কাছে, সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের কাছে। ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময়– কারণ ধর্মের নামে '৭১-এর সেই তান্ডব শুরু হয়েছে।

তাই পয়েন্ট আকারে কিছু করণীয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি–

১. এখন এ দুঃসময়ে দূর লক্ষ্য চিন্তা করে আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে– জঙ্গিবাদ দমনের জন্য এখনই পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা বাদ দিয়ে শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা জীবনকে করে তুলতে হবে আনন্দময়– এটাই সময়। এখান থেকেই তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি পাখা মেলতে শুরু করে। তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা বিষয়গুলোর বীজ বপিত হয় খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গেই। শিশুদের খেলার কোনো বিকল্প নেই।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' চালু করতে হবে। খেলা, গান, নাচের পিরিয়ড থাকতে হবে এবং এসব বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কারু শিল্প, বাগান করা ইত্যাদি বিষয়েও নজর রাখতে হবে।

৩. প্রতি বছর প্রতি প্রতিষ্ঠানে বা কয়েক প্রতিষ্ঠান মিলে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে হবে– আগেও হতো।

৪. এক-ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে সংবিধান এর ১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। ধর্ম-শিক্ষা স্কুলে না দিয়ে দিতে হবে মসজিদ, মকতব, মন্দির, গির্জা ও টোলে– পারিবারিকভাবে। পাকিস্তানি শাসনামলেও ধর্মশিক্ষা ছিল না স্কুলে– বাধ্যতামূলক তো নয়ই। সামরিকজান্তা এরশাদশাহী তা করেছিল। ষাটের দশকে উর্দু বা আরবি ছিল, ধর্মশিক্ষা নয়।

৫. গ্রাম পর্যায়ের স্কুলে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কম করে ৫০০-২০০০/- টাকা হারে শিক্ষা ভাতা দিতে হবে। মাদ্রাসা ধারায় না– যেহেতু তা সংবিধান পরিপন্থী। ব্যাংকের ঋণ-খেলাপিদের দ্বারা লক্ষাধিক কোটি টাকা যখন লোপাটই হয়ে যায়, সরকারের তেমন ক্ষতি হয় না– তখন এই অর্থ প্রদান করা অসম্ভব কিছু না। বৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের নামে যে ডজন ডজন গাড়ি ক্রয়, বাড়ি ভাড়া, বিদেশি কনসালট্যান্ট নিয়োগ ও নানাবিধ অহেতুক বাড়তি খরচসহ পর্বত প্রমাণ অপচয়ের সৃষ্টি হয়– সেই অপচয় বন্ধ করে মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক নিয়মে কার্যকর করলে গ্রামাঞ্চল বা অধিক দরিদ্র অঞ্চলে সবাইকে শিক্ষা ভাতা দেয়া কোনো ব্যাপার নয়। প্রয়োজন শুধু দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ভালোবাসা। একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের মাঝে যাওয়া, মানুষের কল্যাণে কাজ করা। তা হতে পারে জঙ্গি নিধনের মহৌষধও। কল্যাণকর রাষ্ট্রে যদি বেকার ভাতা থাকতে পারে– এখানে শিক্ষা ভাতা কেন হতে পারবে না? এর ফলে অতি দরিদ্র বা অভিভাবকহীন কিছু সন্তানেরা আত্মীয়-স্বজনের কাছে জায়গাও পাবে– মাদ্রাসায় না যেয়ে। তাছাড়া প্রতি উপজেলায় অভিভাবকহীনদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বা হোস্টেল গড়তে হবে। আর শিক্ষা ভাতা দেয়ার পাশাপাশি গ্রামের মা'দের হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া প্রতিপালনে উৎসাহিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুপুরের আহারে যাতে তা অবদান রাখতে পারে প্রোটিন সরবরাহে। কথাগুলো বিস্তারিতভাবে অন্যত্রও বলেছি। আবারও বলছি। বৈষম্য কমাতে হলে নানা ভাবেই তা করতে হবে। বিত্তবানদের বিত্ত বাড়াতে তো নানাপ্রকার ঋণ দেয়া হয়। তাই বিত্তহীনদের এ দাবি অবশ্যই থাকতে হবে।

৬. শহরের স্কুলগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪০% শতাংশ না, ১০০% শতাংশই নিকটবর্তী এলাকার শিশু ওই এলাকার স্কুলেই পড়বে– এতে রাস্তার যানজটও কমবে; একথা আমরা অনেকে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম। স্বল্প আয়ের পরিবারের সন্তানদের ড্রেস বা আনুষঙ্গিক বিষয় স্কুলই সরবরাহ করবে– বিত্তবানদের ট্যাক্স বসিয়ে। বিত্তবানদের ধন-সম্পদ জমিয়ে লাভ কি?– সন্তান যখন বিপথে যাবে তখন এই ধনের আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। অতিরিক্ত ধন সম্পদ যেহেতু সবই সৎ পথে উপার্জিত হয় না– তাই তা কুক্ষিগত রেখে ইংলিশ মিডিয়াম বা বিদেশে সন্তান পাঠানোর চিন্তাও ধনিক শ্রেণীর পরিত্যাগ করতে হবে; যখন বিদেশও নিরাপদ নয়। মনে রাখতে হবে ধনীর জন্য পৃথক স্কুল যেমন সংবিধানবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, তেমন ধর্ম বিরোধীও। অন্যান্য শহরসহ ঢাকা শহরের স্কুলগুলোকে এলাকাবাসীর অর্থেও কিছুটা উন্নততর অবস্থায় নেয়া যায়– তবে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ সরকারিভাবে দিতে হবে সব প্রতিষ্ঠানে। এক সময়ে স্কুল-কলেজ বেসরকারি উদ্যোগে হতো– তবে তা প্রাইভেট হতো না। ভিক্টোরিয়া কলেজ, ব্রজলাল কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, আনন্দমোহন, কারমাইকেল, মুড়াপাড়া চাঁদ (এমসি কলেজ) এমন শত শত নাম বলা যায়। সবই সাধারণ মানুষের উদ্যোগে হয়েছে– বিত্তবানদের সহায়তায়। সেই মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যবসা করা নয়। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমন অনেক কিছুই করতে হবে। সমাজে সাম্য না থাকলে নানাভাবেই জঙ্গি তৎপরতা চলার আশঙ্কা থাকবে। ক্লাসে ৩০:১ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক পেতে হলে সর্বোচ্চ বেতন স্কেল দিতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে– তার পূর্ববর্তী যোগাযোগগুলোর বিস্তারিত তথ্য জানতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাদ্রাসার ধারাও সংবিধান পরিপন্থী। আবার নতুন সমস্যা– জাকির নায়েকের 'Peace School' গুলো যা ইতোমধ্যে নাম বদলিয়ে ফেলেছে। এরা যে জিহাদি জোশে মেতে উঠবে না বা তাদের তৈরি করা হবে না– এ কথা হলফ করে কে বলবে? ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার কল্যাণে শিশু শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জবানীতে দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে– 'আমরা জাকির নায়েকের মতো হবো' – বক্তব্যে।

৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ মুহূর্তে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। তাহলে দ্রুতই দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।– কারণ এ-বয়সেই শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু করতে চায়, প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চায়, সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবতে চায়, ভালো-মন্দ বুঝতে চায়। মনের মতো সংগঠন চায়। আর যদি ভিসি নির্বাচন দিতে না পারেন– তবে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে– নির্বাচন আদায় না করা পর্যন্ত; না-দিলে পরে এদের বিচার করে শাস্তির দাবি জোরদার রাখতে হবে। এতদিন না দেয়ার অপরাধেরও বিচার চাইতে হবে। প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক সব রাজনৈতিক দলকেও গ্রামেগঞ্জে জঙ্গিপনার হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য আহ্বান জানাতে হবে সামাজিক নানা সংগঠন– শিশু-কিশোর, যুবক, শ্রমিক-কৃষক সব ধরনের সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবেই। গড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান ক্লাব : বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানীদের কর্ম ও জীবন পদ্ধতি জানতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিজ্ঞান-চেতনায় জনগণকে সমৃদ্ধ করতে হবে। জারি-সারি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, কবি-গান, যাত্রাপালা, নাটক ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র-গ্রামেগঞ্জে আয়োজন ও প্রদর্শন করতে হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে।

৮. আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ দৃষ্টির কথাও সবাইকে জানাতে হবে– তার দেশেও প্রতিদিন নিরীহ মানুষ নিহত হচ্ছে। টুইন টাওয়ারে যখন ৩ হাজার মানুষ নিমিষে ভস্মে পরিণত হয়– তখন তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোথায় থাকে? এরকম উদাহরণ নিত্যদিনের; তা তাদের এ ধরনের ঔদ্ধত্য দেশবাসীকে জানাতে হবে, তবে এ-ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই ধন্যবাদ পেতে পারেন– নিশা দেশাইয়ের কাছে 'আগাম ইনফরমেশনের জন্য সহযোগিতা চেয়ে।' কারণ, ঘটনা তো তারাই ঘটায়। এক্ষেত্রে তার দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর দেশে দেশে মার্কিনিদের অস্ত্র ব্যবসার জন্য যুদ্ধবাদী নীতি সম্পর্কেও জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে হবে।

৯. তবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের এতদিনের কৃতকর্মের জন্যই যে জঙ্গি তৎপরতা বেড়েছে– তাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। ১৯৯৯ সালে ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে, ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারি পল্টনে সিপিবির জনসভায়, ১৪ এপ্রিলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসবে রমনার বটমূলে, বিভিন্ন গির্জা এবং উপসনালয়ে, পরে ব্লগার হত্যা প্রভৃতি বিষয়ে এ সরকারের নির্লিপ্ততা এবং অশুভ সব উক্তি– জঙ্গি তৎপরতা বাড়তে সহায়তা করেছে।

১০. আর বিএনপি শাসনামলে একযোগে ৬০ জেলায় বোমা হামলা, প্রকাশ্য দিবালোকে আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এসএম কিবরিয়া হত্যা, হরকাতুল জেহাদ, বাংলা ভাইসহ বহু জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান। ২০০৩ সালের ২০ জানুয়ারি জয়পুরহাটের মাজারে ৫ জন খাদেমকে জবাই করে হত্যা, ২০০২ সালে সাতক্ষীরায় সার্কাস ও সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহে ৪ সিনেমা হলে একযোগে বোমা হামলা, ২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রামে বোমা হামলা, ২০০৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইউনুসকে হত্যা, ২০০৪ সালে হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে হত্যা চেষ্টা, ২০০৫ সালের ২৯ নভেম্বর গাজীপুর আইনজীবী সমিতিতে ৪ জন আইনজীবীসহ ৯ জনকে হত্যা, ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনায় উদীচী অফিসের সামনে বোমা হামলায় হত্যা করা হয় উদীচীর ১ জন শিল্পীসহ সাতজনকে, ৫ ভ পুলিশসহ ৫০ জন আহত হন. নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে ২২ জনকে বোমা মেরে হত্যা, সিলেটের মাজারে বোমা মেরে হত্যা, বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মাজারে কুমির হত্যা, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় তাদের সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে আইভি রহমানসহ ২২ জনকে হত্যা, এমন বহু হত্যাসহ বিএনপির সহযোগিতায় এবং জামায়াতের প্রত্যক্ষ মদদে হয়েছে এবং তাবাই করিয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী করে– বিএনপি এবং জামায়াত স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এবং গণহত্যা পরিচালনাকারীদের আজকের জঙ্গি তৈরির ভূমি তৈরি করে যে দিয়েছে– এ সত্য ইতিহাসটুকু জনসমক্ষে আরও স্পষ্ট করে বলার সময় হয়েছে।

ধর্ম নিয়ে কাউকে ব্যবসা করতে না-দেয়ার জন্যই তো সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা মূল নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দুই সামরিকজান্তা যে তা বাতিল করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করলেন– তার জন্য তাদের বিচার দাবি করতে হবে। আবারও বলছি, তারাই জঙ্গি চাষের এ উর্বর ভূমি প্রথম প্রস্তুত করেছে– মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ রাজনৈতিক লড়াই চালাবার এখনই সময়– জঙ্গি চাষের এ উর্বর ভূমিকে ধ্বংস করার জন্য।

[লেখক : সম্পাদক, শিক্ষাবার্তা; সাবেক অধ্যাপক, নটর ডেম কলেজ]